রক্ততীর্থ-পথের পথিক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সম্পাদক: ড. সুব্রত চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক: ড. কাজী সাকেরুল হক
ড. রমেশ চন্দ্র মণ্ডল
পুষ্পেন্দু বিকাশ সাহু
নয়ন শীট

RASATIRTHA - PATHER PATHIK (2ND PART)

A Collection of Bengali Essay

Edited by Dr. Subrata Chakraborty
Sub-Editors: Dr. Kazi Sakerul Haque,
Dr. Ramesh Chandra Mondal, Puspendu Bikash Sahoo

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

গ্র ন্থ স্ব ত্ব ঃ লেখক

প্র চ্ছ দ ঃ সন্তু কর্মকার

নি বে দ ক ঃ অনুভূতি

প্র কা শ ক
অমর মিশ্র কর্তৃক
অনুভূতি প্রকাশনের পক্ষে
কুলিদা, বামনদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, সূচক-৭২১৪২৬

প্রকাশ সহযোগী ঃ গীতা রাণী মিশ্র

ISBN ঃ 978-93-6102-357-6

বি নি ম য় ঃ তিনশত আশি টাকা (৩৮০)

ব র্ণ স্থা প ন ও মু দ্র ণ
অনুভূতি প্রিন্টার্স, ৬৫/২ বাসুদেবপুর রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬, থেকে মুদ্রিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন কিংবা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের গ্রাফিক্‌স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

'পটলডাঙার পাঁচালী' ঘৃণিত বস্তিজীবনের বীভৎস রস : অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের কাহিনী

ড. রাকেশ জানা
সহকারী অধ্যাপক, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বাংলা বিভাগ

কিছু বছর আগে অস্কারজয়ী একটা চলচ্চিত্র দেখেছিলাম 'স্ল্যামডগ মিলেনিয়ার' (২০০৯), ড্যানি বয়েল-এর প্রযোজনায় বিকাশ স্বরূপের Q & A উপন্যাস অবলম্বনে এই চলচ্চিত্রের নির্মাণ হয়। সিনেমাটি দেখে বস্তিবাসীদের জীবনের কদর্য রূপটি চোখে আসে। মনে পড়ে যায় মণীশ ঘটকের পটলডাঙার পাঁচালীর কথা। চলচ্চিত্রে দেখা যায় অন্ধকার জগতের একটা দালাল চক্র কিভাবে বাচ্চা শিশুদের অপহরণ করে তাদের অসত্ পথে ও হীনবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করছে। অপহৃত যে ছেলেটা বা মেয়েটা ভালো গাইতে পারে তার চোখ দুটো অন্ধ করে, কিংবা যে কোন অঙ্গহানী ঘটিয়ে রাস্তায় বসিয়ে ভিক্ষে করায়। আবার যে মেয়েটা দেখতে সুন্দর বা নাচতে পারে তাকে তারা বারাঙ্গনার কাছে বিক্রি করে। এই প্রকৃতির ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটু মোড়ল বা জ্যাঠা গোছের ছেলেকে তারা পকেটমার, চোর, ছিনতাইকারী, মস্তান বা গুন্ডা তৈরি করে। এই প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের কাছ থেকে আয়ের বেশিরভাগটাই দালালর দস্তুরি বা বখরা হিসেবে নিয়ে থাকে। সিনেমার মতোই তথাকথিত ভদ্রসমাজে ব্রাত্য বস্তিবাসীদের জীবনের অন্ধকারতম দিকটির এমন নির্জলা পরিবেশন বাংলা সাহিত্যে মণীশ ঘটকের পূর্বে আর কেউ করেননি। তাই মণীশ ঘটকের সাহিত্যে গল্প পাঠক প্রথম পেয়েছিলো বস্তিজীবনের অচেনা গন্ধ। শুধু বিষয়ে নয়, তার পরিবেশ প্রভাব কণ্ঠস্বর বা সুর সবই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এ শুধু এক নতুন স্বাদের সাহিত্য নয়, তিনি বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকেও বিস্তৃত করবার গৌরব অর্জন করেছেন। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত মণীশ ঘটক প্রসঙ্গে তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন- "কল্লোলে আত্মপ্রকাশ করে সে যুবনাশ্ব ছদ্মনাম নিয়ে। সেদিন যুবনাশ্বের অর্থ যদি কেউ করত 'জোয়ান ঘোড়া' তাহলে খুব ভুল করত না, তাঁর লেখায় ছিল সেই উদ্দীপ্ত সরলতা। কিন্তু এমন বিষয় নিয়ে সে লিখতে লাগল যা মান্ধাতার বাপের আমল থেকে চলে এলেও বাংলাদেশের 'সুনীতি সংঘের' মেম্বাররা দেখেও চোখ বুজে থাকছেন। এ একেবারে একটা নতুন সংসার অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা। বলতে গেলে মণীশ-ই 'কল্লোল'-এর প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব"[১]। মণীশ ঘটকও তাঁর পটলডাঙার বস্তিবাসীদের জীবনে অন্ধকারময় বীভৎস রসের দিকটিকে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে বর্ণনা করেছেন। এই 'পটল ডাঙার পাঁচালী'-তে খেঁদী পিসির আস্তানায় "মেয়েগুলোকে বয়স

হবামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হত! দলের এ একটা মস্ত আয়। ছেলেগুলো পকেট কাটা থেকে হাতে খড়ি পেত"২। আবার অন্যত্র 'রাত-বিরেতে' গল্পে পূর্বোক্ত সিনেমার মতই বীভৎস জীবন বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পে পটল ডাঙার ঝুমন হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর পাচারকারী; তার সাথে হাসপাতলেরই এক আয়ার যোগ-সাজস রয়েছে। সেই লুকিয়ে রাত-বিরেতে ঝুমনের কাছে শিশু পাচার করে থাকে। শিশু বিক্রির দাম নিয়ে তাদের কথা কাটাকাটিতে প্রকাশ পেয়েছে সেই নারকীয় চিত্র। ঝুমন আয়ার কথোপকথনটি সংক্ষেপে প্রকাশ করছি- "...ছোট মানসি। তোদের বেশি দাম দেব কোন সাহসে? যদি ম'রে যায়? আর আমার তো নে গিয়ে পুষবার খরচ আচে! পাঁচ ছ-দিনের ছা নিয়ে গে ন-দশ বছরেরটি করতে হ'লে খাওয়াতে পরাতে কী কম খরচটা হয়? তার উপর সব কটা দেখতে ভালো হয় না। খারাপ হ'লে দামও কমে যায়। কতক গুলোকে আবার ঘরে বসিয়ে হিল্লে করতে হয়। এসব খরচ পুইয়ে শেষ-মেষ আমার তো থাকে কচু! আর ছোঁড়াগুলো তো বাজে খরচ! খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করি- চোক ফুটলেই নিজের পত দ্যাকে-তার মানে? গোড়ায়ই খাক করে দিস না সে গুলোকে? সব গুলোকে নয়। যেগুলো দিই, তাদের কাচ থেকে অবশ্যি কিছু আদায় হয়। সেই লালচুলো বাচ্চাটার কতা মনে আচে তোর? সেটাকে হাত মুচড়ে কোমরের সাথে বেধে দিইছিনু। দিব্যি নুলো হয়ে গেচে এখন, পতে বসে, রোজগারও মন্দ হয় না"৩।

আসলে তাঁর এই "রচনাগুলি ঠিক গল্প নয়, গল্পের স্বাদবাহী স্কেচধর্মী"৪। গল্পের উপস্থাপনা রীতিতে "বাচন-কলার চেয়ে বক্তব্যের প্রতিই তাঁর প্রগাঢ় ঝোঁক"৫ লক্ষ্য করা যায়। পটল ডাঙার পাঁচালীর বেশিরভাগ গল্পের বিষয় সংগৃহীত হয়েছে জীবনের বীভৎসতম অঞ্চল থেকে। এই গল্প শুরু হয় খেঁদী পিসির আস্তানার বিবরণ দিয়ে। খেদী পিসির বস্তির অধিবাসীরা হল প্রধানত ভিখিরি, পকেটমার, ছেলেধরা ও বেশ্যা। এই নিঃস্ব মানুষগুলি সমাজের দুরারোগ্য ক্ষতের মতো বস্তিতে বাস করে। এর সর্বহারা কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে এদের অবস্থান। কুকুরের মত আস্তাকুঁড়ের জীবন এদের। এখানকার বাসিন্দারা দিনের পর দিন বাস করে পুঁতিগন্ধময়, মানুষের অবাসযোগ্য পরিবেশে- "পটলডাঙার ভিখিরিপাড়া। প্যাচপেচে পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে, সার সার, গায়ে গায়ে লাগান। রাতদুপুর। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে এমনি একটা হোগলার কুঁড়ের অন্দর। এক কোণে দেয়ালের গায়ে বছর দুয়ের পুরোনো একটা ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা ঝুলি, এই সব। জানালা একটিও নেই, দোরের ঝাঁপ টানা। দোর- গোড়ায় একটা কেরোসিনের ডিবে থেকে মিটমিটে আলো অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্চে। ধোঁয়ার গন্ধ বাইরের পচা কাদা ও নোংরা আস্তাকুঁড়ের গন্ধ; ঘরের পেছনে দিন দুই হ'ল একটা কুকুর মরে প'চে আছে, তার গন্ধ- আর কুঠে বুড়ির গলিত ঘায়ের

গন্ধ একসাথে ঘরটাকে ভরে রেখেচে"[৬]। আবার 'গোষ্পদ' গল্পে মণীশ ঘটক পটল ডাঙার বস্তির এঁদো গলির বর্ণনা দিচ্ছেন- "সার-সার মাটি লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। নোংরা। একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম ফেলার উপায়টুকু বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে। মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই- সর্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া।"[৭] 'রাত বিরেতে' গল্পের পরিবেশও অনুরূপ, গলির ঘর অন্ধকারে "দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। শীতকালেও সে জায়গাটা কাদায় প্যাচ প্যাচ ক'রচে"[৮]। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুস্থ ভাবনার সঞ্চার হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তবুও বীভৎসতার পাঁকে চলে মানুষের মানুষ্যত্বের বেঁচে থাকার লড়াই। মণীশ ঘটকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই এই অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের প্রচ্ছন্ন আভাস রয়েছে।

মোড়ল খেঁদির কড়া নজরদারীতে এখানকার বাসিন্দারা- নফর, ফকির, রতন, গুবরে, সদি, নুলো, কুঠেবুড়ি, ডাকু, পটল, বাঞ্ছা, হরিমতি, বিন্দি-দাঁতী অন্ধকারময় ঘৃণিত পেশার সাথে যুক্ত হয়। তবে তাদের মধ্যেও নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে। নিয়ম ভঙ্গ করলে খেঁদী মোড়লিনী চরম শাস্তিও দিয়ে থাকে। তাই খেঁদির অনুমোদন ভিন্ন পটলডাঙার ভিখিরি দলে হঠাৎ কোন বহিরাগত প্রবেশ করতে পারে না। তাছাড়া খেদি পিসির আস্তানায় থাকতে গেলে প্রত্যেকেরই দস্তুরি বা বখরা দিতেই হয়। বিকলাঙ্গ পুরুষ ছাড়া খেঁদি পিসির বিখ্যাত ভিখিরি দলে সাধারণত মেয়েরাই গলির গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষে করতে বেরোত। মেয়েরা সোমত্ত বয়সে দেহব্যবসা করতো, এখন বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যারামে প'ড়ে পথে বেরিয়েছে। তাছাড়া "খেঁদি-পিসির বিখ্যাত পটল ডাঙার দল যখন পথে ভিক্ষে করতে বেরুতো, তখন দলে একটিও পুরুষ থাকতো না বটে, কিন্তু তাদের আস্তানার অন্ধকূপগুলির বাসিন্দা শুধু ওই মেয়ে কটিই ছিল না। দু-এক জনের ঘর ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দুটি-একটি করে পুরুষ থাকতো। পথে বেরুনো ছাড়াও তাদের অন্য রোজগার ছিল। রাত-বিরেতে পকেটকাটা অথবা ছোট খাটো চুরি চামারি করা, অবশ্য এসব আয়ের কথা প্রায়ই দলে ফাঁস হ'ত না। মোড়ল তাদের খেঁদি"[৯]। এই পটল ডাঙার পুরুষগুলো ছিল নামকরা, "ও- তল্লাটে অমন বদমাইস, হৃদয়হীন জানোয়ার আর কোন দলেই ছিল না"[১০]। মণীশ ঘটক অন্ধকার জীবনের ভাষ্যকার, এদের সমাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- "সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, কোন সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি-বছর ছেলে হত, একটি বছরও কামাই পড়তো না। কিন্তু ওই হওয়া পর্যন্তই। তারপর, সে সব শিশুদের ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হত, দেখবার শোনবার কেউই থাকত না। বেশিরভাগই মরত, যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আর দশজনের মত বন্ধনহীন ভাবে বেড়ে উঠত। বাপ-মার ঠিক-ঠিকানা কেউ জানত না। তারা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি"[১১]।

এই আপাত বিচ্ছিন্ন ও বন্ধনহীন অশুভ অপাংক্তেয় পাতালপুরীর বাসিন্দাদের 'পেটের ক্ষুধা এবং সর্বাঙ্গের ক্ষুধা' ছাড়া অপর কোন চাহিদা ছিল না। তাই পটল ডাঙার বস্তির কাহিনী সে যুগে মধ্যবিত্ত রুচিবোধকে প্রবল ভাবে আঘাত করেছিল। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে বস্তিবাসীদের জীবন চিত্রণে রুচিবোধ ও নীতির প্রশ্ন না করে সাহিত্যিক পরিমিতিবোধের প্রশ্ন রেখে বলেছেন- "জীবনে বিকৃতি, উন্মত্ততা, ক্লেদাক্ত পঙ্কিলতা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মতই সত্য; কিন্তু সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মতো তা স্বভাবত অনাবৃত্ত নয়। মানুষের ইতিহাসে অন্ধকারের বিষাক্ত চোরাগলি যে স্বাভাবিক নিয়মেই আবৃত, তার কারণ কেবল নীতিবাগীশের জবরদস্তিই নয়। মানব-প্রকৃতির সহনীয়তা ও গোপন বাসনার আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারাও সভ্যতার এই রীতি বহু পরিমাণে পুষ্ট। যাকে পাশবতা বলে স্বীকার করি, যুবনাশ্বও করেছেন তাঁর গল্পের মধ্যে তার নির্জলা পরিবেশন একটা মাত্রা অতিক্রম করে গেলে অনাচ্ছন্ন রসচেতনার পক্ষে আর সুসহ থাকে না। পাশবিক অন্ধতার গায়ে মানবতার ছোঁয়া দগদগে ঘায়ে প্রলেপের মতো স্বস্তিকর হতে পারে, যদি ঐ অন্ধকার-চারণের মূলে শিল্পীচেতনার কোনো আন্তরিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়। কিন্তু দরিদ্রের, ভিখারির, বিকৃত মানুষের বিকৃততম দৈহিক ক্ষুধার নিরবধি চিত্রণের মূলেও যুবনাশ্বের মনে 'আধুনিক অর্থে কোন সমাজ-চেতনা ছিল না'-একথা অচিন্ত্যকুমারও স্বাকার করেন। তা সত্ত্বেও আলোচ্য গল্পগুলি, তাদের বিষয়, পরিধি, চরিত্র ও প্রকরণগত বৈচিত্র্যহীনতা নিয়েও বিশেষভাবে অশ্লীল, অপাঠ্য বা বিরক্তিকর মনে হয় না"[১২]। সাহিত্যে এই বিকৃত রুচির চিত্রণ প্রসঙ্গে মণীশ ঘটকও প্রথম প্রথম নিজেকে নীতি প্রশ্নের দোলাচলে আটকে রেখেছিলেন- "এই কাল্পনিক বস্তির সত্যকারের বাসিন্দাদের নিয়ে গল্প ফাঁদতে উৎসুক হলাম বটে, তবে একথাও মনে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল, দেখা দূরের কথা, শুধু ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে; তাদের আখ্যান পড়বেই বা কে, ছাপবেই বা কে? অবিচার-অন্যায়-অসাধুতা-ভন্ডামি কি সাহিত্যের উপজীব্য? চুরি- ডাকাতি-ছিনতাই-বলাৎকার? মাতলামো-বেলেল্লেপনা-খিস্তি-খেউড়? দেশ-কাল- সমাজ-মানুষ-জীবন-মৃত্যু, অমোঘ প্রকৃতির বিধানে অনাদিকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। সুন্দর কুৎসিত একসঙ্গে বসবাস করছে সে আইনে। শিল্প-সাহিত্য সুন্দরকেই খুঁজছে সমস্ত দৈন্যের মাঝ থেকে দৈন্যকে বাদ দিয়ে। কালো দিকটার যথাযথ ছবি আঁকতে কেউ সাহস পায়নি, কালোর মসলায় যে আলোর ছবি আঁকা যায় সে কথাও কেউ ভাবেনি। জীবনের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বিকৃত জীবন পঙ্গু জীবনকে উপেক্ষা করেই শিল্পী সুন্দরের সাধনা করেছে। কিন্তু কেন? কেন দৈন্য বুভুক্ষা হাহাকার আছে জেনেও এড়িয়ে গেছে সবাই আঁকতে? মনটা বিদ্রোহী হয়েই রইল শুধু-লেখা হয়ে উঠল না"[১৩]। পরে কবি বন্ধু বিজয়ও বললেন এই বিষয় নিয়ে লেখা যায়- "অল্পক্ষনের জন্য সাড়া জাগানো যায়,

তৃপ্তি আনা যায় না"১৪। কিন্তু মণীশ ঘটকের মন তখন বুঝেছিল- "তৃপ্তি! প্রবল ঝড়ে বালুর মধ্যে মুখ গুঁজে সর্বনাশ ভুলে থাকার তৃপ্তি! সুদৃশ্য ব্যান্ডেজে গলিত কুষ্ঠ ঢেকে গিলে করা কামিজ আর কোঁচানো ধুতি পরে বেড়ানোর তৃপ্তি। মান্ধাতার আমল"১৫। তাই মান্ধাতার বাবার আমল ভেঙে তিনি লিখলেন অনবদ্য 'পটলডাঙার পাঁচালী'। আসলে মণীশ ঘটক কলকাতার রাজাবাজারের লেংড়ি বিবির বস্তির আস্তানার অধিবাসী ফজলের সঙ্গে, বস্তিবাসীদের কদর্য জীবন লক্ষ্য করে মাসাধিক কাল ঘুরেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রকাশ হল 'পটলডাঙার পাঁচালীর' গল্পগুলি।

মণীশ ঘটকের পটলডাঙার পাঁচালীর প্রথম গল্প 'গোস্পদ' শুরু হয়েছে রবিবারের অলস দুপুরে; কড়া রোদে চারিদিক যখন নিস্তব্ধ ও শ্রান্ত তখন খেদি পিসির তত্ত্বাবধানে পটলডাঙার ভিখিরিদল শহরের গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে। এই দলে সবাই প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা আগে সোমত্ত বয়সে এরা দেহব্যবসা করতো। এখন বিগত-যৌবনারা রোগে পড়ে পথে বেরিয়েছে। এই দলেই বহিরাগত হিসেবে এক মেয়ে ঢুকে পড়ে। সে মোড়ল খেদি পিসির সতর্ক চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। খেদি ধমক দিয়ে তার পরিচয় জানতে চায়। মেয়েটির কাছে জানা যায় সে পাড়াগাঁয়ের গেরস্ত ঘরের বৌ। গ্রামের এক পর-পুরুষের সাথে কালীঘাট দেখতে এসে সেই পুরুষটির কাছে গয়নাগাঁটি সর্বস্ব হারিয়ে প্রতারিত হয়। এরপর নিরশ্রিতা মেয়েটি গলার হার বাড়িউলিকে দিয়ে তার ঘরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও বাড়িউলি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাত্রে ঘরে লোক ঢোকায়। পরেরদিন চুপিসাড়ে সে বেরিয়ে এসে, গ্রামে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত রাস্তা বন্ধ দেখে পটলডাঙার দলে এসে মিশেছে। মেয়েটির কান্নায় খেদি পিসির মনের কোনে এক সহানুভূতি সৃষ্টি করে; যদিও তার স্বভাবে কোন মায়া-মমতা নেই। এই কুলত্যাগিনী মেয়েটি জানায় সে বেশ্যা হতে চায় না, কিন্তু তার নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন। তাই খেঁদি পিসির অভয়বাণী ও সতর্ক দৃষ্টির ঘেরাটোপে মেয়েটি পটলডাঙার দলে বিনা শর্তেই ভর্তি হয়ে যায়- "আচ্চা, আচ্চা ভয় নেই; কেউ তোমায় কিছু করতে পারবে না। আমি একা থাকি, এই খেনেই দুজনে থাকব' খন"১৬। গল্পশেষে মণীশ বাবুর এই ভঙ্গিটি প্রসঙ্গে সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- "এ শুধু মেয়েটি ভর্তি হওয়া নয়, আমাদের অর্থাৎ পাঠকদেরও ভর্তি হওয়া। যতই পাঁচালীতে ঢুকি, ততই যেন ঐ ব্রাত্যদের শরিক হয়ে যাই"১৭। এভাবেই গল্পের ক্রমপরম্পরা এগিয়ে যায়; বেড়ে চলে পটলডাঙার দল। তবে এই গল্পে "পরিবেশের এই বর্ণনা, ভাষার মিতব্যয়িতা, শব্দের অর্থঘনত্ব, কথ্যভাষার অভূতপূর্ব সাবলীল ব্যবহার, বাক্যের বিমূর্ত ব্যঞ্জনা যথার্থ ভয়াবহ করে তোলে। যেখানে কাক নামক প্রাণীর ক্লান্তি, অবসন্নতা আছে, কিন্তু মনুষ্য নামক পটলডাঙার জীবদের ক্লান্তি নেই, এই তুলনাই পরিবেশকে সামনে টেনে আনে। পেটের ক্ষুধা, দেহের হাহাকার কি ভয়ঙ্কর তা যেন বর্ণনায়

লেখক 'সাহারা' সৃষ্টি করে ফেলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না পটলডাঙার দলকে"[১৮]।

এরপর দ্বিতীয় গল্পের নাম 'পটলডাঙার পাঁচালী', এখানে পটল ডাঙার বস্তির মোড়ল খেঁদি পিসির পটলডাঙার কৃমিপঙ্ক জীবন ও পরিবেশের বর্ণনায় লেখক ঘৃণিত বস্তিজীবনের সার্থক ভাষ্যকার। এই এঁদো পচা গলির দমবন্ধ হওয়া পরিবেশে, প্যাচপ্যাচে কাদার মধ্যে হোগলার কুঁড়ের স্যাতসেঁতে মেঝেতে; ছেঁড়া কাঁথা ও মাদুরে সার সার লাশের মতো ঘুমায় নুলো, কুঠেবুড়ি, একচোখ কানা গোবরা, ঘেয়ো নফররা। কিছুক্ষণ পর ঐ কুঁড়েতে একগাল মাংসহীন চুল বিড়ে করে বাঁধা অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া কাপড় পরিহিতা দেহপোজীবিনী রূপহীনা সদি ঘরে ঢুকতে গিয়ে কুঠে বুড়ির গায়ে হোঁচট খেয়ে গাল শোনে- "মর, মর! ... রূপুসি! কেলি শেষ ক'রে দুপুর রাতে কোঁদল করতে এলেন"[১৯]। নফর ঘায়ের যন্ত্রনায় কারাতে থাকলে সদি তার কাছে এসে সযত্নে মলম লাগিয়ে দেয়। সদির এই মমতাময়ী মানবিক দরদী রূপ দেখে নফরের নিজের মায়ের কথা মনে আসে- "একটু আবছা আবছা আমার একজনের কতা মনে হয়। খুব ছোটবেলা, ...আমার বাপ যকন আমায় ধ'রে পিঠত, ...সে তকন আমায় নিয়ে ষাট-ষাট করত, ...খেতে দিত!"[২০] কিন্তু পটলডাঙার এই বস্তিতে থাকতে হলে শর্ত মেনে খেঁদি পিসিকে দস্তুরি মেটাতে হবে, তাই সদি আজ সারাদিন দস্তুরি যোগাড়ে পথে বেরিয়ে পুলিশদের কাছে বিনা পয়সায় ধর্ষিত হয়। রক্ষক পুলিশের এই ভক্ষক রূপ সমাজ ও প্রশাসনের নগ্ন রূপকে প্রকাশ করে। এরপর ঐ ভগ্নপ্রায় হোগলার কুঠিতে চুরচুরে মাতাল ফকরে প্রবেশ করে যার বগলে রয়েছে ভদ্র-গৃহস্থঘরের ভোজের উচ্ছিষ্ট এঁঠো-'কলা পাতায় লেগে থাকা সামান্য অন্ন'। ঐ উচ্ছিষ্ট পাতার অবশিষ্ট অন্ন ক্ষুধার্ত সদি সামনে পেয়ে চাটতে থাকে। শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড ক্ষিধের জ্বালায় অবসন্ন সদি ফকিরচাঁদের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে প্রচুর তাড়ি খেয়ে দেহ উপভোগের দ্বারা দস্তুরির টাকা জোগাড় করে, ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। খুব ভোরে ঘুমন্ত সদির আঁচল থেকে রাতের রোজগারের দস্তুরির পয়সা চুরি করে কুঠেবুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে যায়। সকালে খেদি দস্তুরি আদায় করতে এলে তার প্রচণ্ড চিৎকারে সদির ঘুম ভাঙে। এরপর দস্তুরির পয়সা আঁচলে নেই দেখে সদি কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে কান্নাতে গলবার পাত্র নয় খেদি। খোঁদ সদিকে পটলডাঙা থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে হঠাৎ নফরের ছোটবেলায় মায়ের উপর বাবার অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। সে সদির দস্তুরির পাওনা খেঁদিকে মিটিয়ে দেয়। নফরের এই আচরণে "সদি বজ্রাহতের মত একদৃষ্টে নফরের দিকে তাকিয়ে রইল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের ভেতর আসতে লাগল"[২১] (পৃ-৬৮)-এ আলো যেন অন্ধকারের পরাজয়ের আলো। "তবু মনে হয় মানুষ অমর, -ব্যাধিক্লিষ্ট, গলিত শরীরের ভগ্নাংশকে আশ্রয় করে টিকে- থাকা পাশব-বৃত্তির কোন চোরাবালিতে লুকিয়ে থাকে মানুষ, মানুষের ক্ষুধা! হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে মানুষের

সেই অপরাজেয় শক্তি সিংহবাহিনীর মতো আজন্মের পশুবলকে সংবৃত আচ্ছন্ন করে ফেলে, টুকরো মানুষের দেহ-মন ঘিরে পূর্ণ মানুষের মহিমা পূর্ণিমার দ্যুতিতে যেন উদ্ভাসিত হয়"[২২]। সমালোচক আজহার ইসলাম এর মধ্যেই বীভৎস রস অতিক্রম করে মানবিক রস খুঁজে পান - "...লেখক যখন এই কৃমিপঙ্ক পরিবেশে নফর ও সদির পারস্পরিক সুকুমার বৃত্তির উপর স্বর্গীয় জ্যোতি বর্ষণ করেন, তখন মনে হল যেন দমবন্ধ হয়ে যাওয়া গুমোট পরিবেশে এক ঝলক টাটকা হাওয়া বহলো। বোঝা গেল, তাড়ি গেলা মাতালদের মাতলামা অভব্যতা আর জঘন্য কুৎসিত ইতরতার ছবি আঁকাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, পতিতা ও নীচের মধ্য থেকে মানবতা ও সাধারণ জীবনের মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কাম্য"[২৩]।

পটলডাঙার তৃতীয় গল্প 'কালনেমি'। এই গল্পে যৌবনবতী ময়না রেলে পা-কাটা বেকার স্বামী ডাকুকে নিয়ে, কোথাও আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য হয় পটলডাঙার বস্তিতে আসতে। সেখানে মোড়ল খেদি পিসি ভিক্ষা করার অনুমোদন দিলেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়- "থাকবি থাক! কিন্তু ইস্তিরি-ফিস্তিরি ক্যানো বাবা। এখেনে ও-সব চলবে না, মুড়ি-মিছিরির একদর হেতায়!"[২৪] কিন্তু ময়না তার ইজ্জত বাঁচিয়ে এখানে ডাকুর সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েই বাঁচতে চায়। কিন্তু এই অসুস্থ পরিবেশে তা সম্ভব হয় না। এরপর হঠাত একদিন হরিমতির ঘরে লালসামত্ত রতনা ময়নার পথ আটকিয়ে তার সাথে জবরদস্তি করতে চায়। কিন্তু ময়নার ঘুঁষিতে রক্তাক্ত হয়ে রতনা চরম লাঞ্ছিত হয়। মারের লাঞ্ছনার চেয়েও ওখানে উপস্থিত বস্তিবাসীদের কথার লাঞ্ছনায় রতনা তেতে ওঠে-"....আচ্চা বাবা, এক মাগে শীত পালায় না, আমিও ওকে দেকে নেব! ও শালীর ড্যামাক না ভাঙতে পারি তো..."[২৫]। এভাবে কিছুদিন কেটে যায়; ময়না ও ডাকুর একটি সন্তান হয়। ছেলেকে নিয়ে ময়না ও ডাকুর মাতামাতি বস্তিবাসীদের চোখে বেখাপ্পা ও আদিখ্যেতা বলে মনে হয়। তারা দুজনেই কাজ ছেড়ে সঞ্চিত টাকায় সংসার চালায়। খেঁদি মোড়লিনী ময়নাকে উদ্দেশ্য করে বলে-"তু মরলে ওকি তোর ছেরাদ্দ করবে?"[২৬] তবুও ময়না খেদিদের কথাকে গায়ে মাখে না। ছেলে দু'মাসের হলে আবার যে যার কাজে বেরোয়। রতনা ও তার দলবল এরপর হঠাত একদিন ময়নাকে একা বাগে পেয়ে ধর্ষণ করে। ময়না খেঁদির কাছে গিয়ে নালিশ জানালে খেদি বলে- "...তা এতে আর দোষের কী হয়েচে বাবা। রতনাকে তো ছুঁড়িরা পছন্দই করে! তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব। ....তাও বলি যেকানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে তো? পেট চালাবার জন্যে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কী আর সোয়ামি-ইস্তিরি ওসব ভড়ং চলে? ভদ্দরনোকি করতে হ'লে তার ঠাই আলাদা"[২৭]। আসলে যে সব সমাজে সোমত্ত মেয়ের ফি বছর সন্তান হয়। যেখানে বাবা-মায়ের ঠিক থাকে না। উঠতি বয়সের মেয়েদের বেশ্যালয়ে চালান দেওয়া হয়; আর ছেলেগুলোকে পকেটকাটা বিদ্যায় হাতেখড়ি দেওয়ার রীতি প্রচলিত

আছে। সেই পরিবেশে লালিত হওয়া লম্পট- দুশ্চরিত্র রতনা ও তার সঙ্গীদের কাছে ময়নার ধর্ষণ স্বাভাবিক ঘটনা। তাই ময়না যখন ডাকুর কাছে ফিরে এসে এর প্রতিকার চেয়েছে। স্বামী ডাকুর কাছে এই ঘটনার কোন প্রভাব পড়ে না; কেননা পঙ্গুত্ব তার পৌরুষকে বিনষ্ট করেছে। ডাকু জানে "থাকতেই হবে যখন হেতায়, তকন কী হবে ঘাঁটিয়ে!"[২৮] তাই "তার মুখে মরমির দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভুখের জ্বালা! মত্ত পশুর মতো দু-চোখ জ্বলছে"[২৯]। ময়না এই অপমান কোন ভাবেই মেনে নিতে পারে না সে ক্রোধে ক্ষোভে অভিমান ও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বশত সম্পর্কের বন্ধনকে অস্বীকার করে আবার রতনের কাছে ফিরে গেছে। কিন্তু রতনের কাছে যাওয়ার সময় ডাকু ময়নাকে বলেছে- "দোহাই তোর, একটি বার আসিস রাতে"-এখানে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে পশুর লালসা মানুষের মানবিক বৃত্তি গুলিকে নষ্ট করেছে। এছাড়াও দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসের অমর্যাদা ময়নার শুভবোধকে নষ্ট করে পথভ্রষ্ট করেছে। "আসলে ময়নাকেও অভ্যস্ত হতে হয়েছে পটলডাঙার অপাঙক্তেয় অদ্ভুত জীবনে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ লড়াইয়ে। এভাবে পটলডাঙার পাঁচালীকার মণীশ ঘটক ভদ্র ও ভদ্রেতর জীবনের পার্থক্য ও নির্মম নিঃস্ব সর্বহারা জীবনের সংকট ও জটিল সমস্যা তুলে ধরেছেন নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায়"[৩০]।

পটলডাঙার পাঁচালীর পরের গল্প 'মন্থশেষ'। রাজাবাজারের মোড়ে এক ধনী গৃহস্থের চার-পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চার কাছ থেকে হার চুরি করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে বামাল বাচ্চাকে নিয়ে পটলডাঙার আস্তানায় হাজির হয় বাঞ্ছারাম। খেঁদি এতে পুলিশের বিপদের সম্ভাবনা জেনে খুশি হয় না, কিন্তু হারটা দেখে লোভ সংবরণ করতেও পারে না। তাই ঠিক হয় ছেলেটাকে মেরে ফেলার। ঠিক সেই সময় খেঁদির ঘরে ঢোকে দেহপোজীবিনী বিকৃত দর্শনা দাঁতী। সে সুন্দর ছেলেটিকে খেঁদির ঘরে দেখে চক্রান্তের ইঙ্গিত পায়। এরপর হঠাত্-ই ছেলেটি দাঁতীকে দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে; আর তার অব্যক্ত গোঙানিতে 'মা' শব্দটা শোনা যায়। এতে দরদী দাঁতী খেঁদির কাছে অসাবধান বশত 'আহা' করে ওঠে; পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে বলে 'আ-মর! '। বাঞ্ছা ও খেঁদি দাঁতীর এই উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। তাই খেঁদি দাঁতীকে রোজগারের ধান্দায় বেরনোর পরামর্শ দিয়ে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাত-ই দাঁতী সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে অনুমান করে ছেলেটাকে কোলে তুলে বলে- "নে গেলাম পিসি দরকার হলে নে যাস"[৩১]। দাঁতীর এই ব্যবহারে বাঞ্ছা চাপা আক্রোশে লাফাতে থাকলে খেদি সামাল দেয়। বিচক্ষণ মোড়ল খেদি বোঝে বিন্দি দাঁতীকে চটানো ঠিক নয়। দাঁতীর ইচ্ছে হয় এই সুন্দর ছেলেটিকে পুষবার, কিন্তু মোড়ল খেদি পিসির তাতে মত নেই। অগত্যা খেদি পিসির ছেলেকে প্রয়োজন হলে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে বিন্দি দাঁতী তাকে নিজের হোগলার কুঁড়েতে নিয়ে যায়। এদিকে

"খেঁদির ঘরে ছেলেটিকে দেখা অবধি বিন্দির বুকের মধ্যে অত্যন্ত মরচে পড়া কোন একটা তারে কেবলি কাঁপন উঠছিল, তাতে তার নিজেরি থেকে থেকে অবাক লাগছিল। পেটের ক্ষিদে, সারা গায়ে ক্ষিদে ক্ষিদে, এসবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না, সে ক্ষিদের পথও জানা ছিল। কিন্তু বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কিসের এ ক্ষিদে! এ একদম নতুন! ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার দুগাল ভরিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো ...আরো-কিন্তু আশ মিটছিল না"[৩২]। যদিও "ছেঁড়া কাঁথা, কম্বল, এদোগলির পচা পাঁক, অভাব ও অসুখের কারানি, ক্ষিদে ও পশুলালসার হাহাকার, এরই ভেতরে সে আজন্ম প্রতিপালিত"[৩৩]। তাও কোন এক অজানা বাৎসল্য রসে তার অন্তরে ঝড় বইছিলো। তাই ছেলেটিকে বাঞ্ছা ও খেদি মোড়লিনীর কাছ থেকে রক্ষা করতে; রাজাবাজারের মোড়ে প্রামানিকদের বাড়িতে ছেলেটিকে ফেরত দিতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। আদালতে হার চুরির অপরাধে তার হাজতবাস হয়। কিন্তু পটলডাঙার বস্তির সুখবর যে সে পুলিশের কাছে কারো নাম প্রকাশ করেনি। পুরাণে কথিত আছে মন্থশেষে অমৃত ও হলাহল উঠেছিল। আলোচ্য গল্পে বিন্দি দাঁতী ছেলে ও হার চুরির মত অপরাধের হলাহল নিজে জেনেশুনে পান করে শিশুহত্যার মত অপরাধকে নিবারণ করেছে। তার চরিত্রে মানবিকতার মত অমরত্বের বৈশিষ্ট্য পাতালপুরীর অন্ধকার আবহাওয়াতে নব-সূর্যোদয় ডেকে আনে।

এরপরের গল্প 'মৃত্যুঞ্জয়'-তেও মণীশ ঘটক মমতা-ভালোবাসা ও সর্বোপরি মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন। খেদি পিসির পটলডাঙার দলে মেয়েরা যখন ভিক্ষে করতে বেরুতো তখন তাদের দলে একটা পুরুষও থাকতো না। কিন্তু এই ভিক্ষুক দেহব্যবসায়ী মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকের বাসাতেই "দুটি-একটি করে পুরুষ থাকতো"। তারা রাত-বিরেতে চুরি ছিনতাই ও পকেটমারী করতো। "পটলডাঙার পুরুষগুলো নামকরা। ও তল্লাটে অমন বদমাইস হৃদয়হীন জানোয়ার আর কোনো দলেই ছিল না। দলের সেরা লোক এই চঞ্চু। সে পারতো এমন কাজ নেই। তার এই গুণের জন্যেই খেদি তার ওপর খুশি ছিল"[৩৪]। কিন্তু এই চঞ্চুর মত বদমাইশ, হৃদয়হীন জানোয়ারের চিত্ত বদল হল একটি অসহায় রোগা বোবা মেয়েকে কেন্দ্র করে। সে অপরাধ জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফেরালো। এমন কি দলের কেউ যদি ছিনতাই করতো তাতে সে বাধাও দিত। মোড়ল খেঁদির কাছে চঞ্চুর নামে বিস্তর অভিযোগ আসতে লাগলো তাতে উদ্বিগ্ন খেঁদি এই বোবা মেয়েটির সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক জানতে চাইলে সে এই মেয়েটিকে তার বোন বলে জানায়। এতে খেদি সহ সকলেই অবাক হয় কেননা, এই নরকের জীবরা "মা-বোনের ছোঁয়াচ ঢের দিনেই এড়িয়ে"এসেছে। এরপর হঠাত্ একদিন খেদি ও তার দলবলেরসামনে রতনা চঞ্চু ও বোবা মেয়েটিকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করলে, চঞ্চু রেগে রতনাকে প্রহার করে। এতে ক্ষুব্ধ খেদি পটলডাঙার শৃঙ্খলা রক্ষার্থে

হুকুম জারি করে- চঞ্চুর এই দলে থাকতে গেলে ঐ মেয়েটিকে ত্যাগ করতে হবে। পরেরদিন ভোরবেলা চঞ্চু ঐ বোবা মেয়েটির হাত ধরে পটলডাঙা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এই দেখে রতনের মনে হয়েছে "শক্ত একটা কিছু বেঁধেচে বাবা। নইলে চঞ্চুর মতো স্যায়না ঘাগি"[৩৫] এই অসমাপ্ত অর্ধকথনে বক্তব্যের গভীরতাকে অনুধাবন করে নিতে অসুবিধে হয় না। লেখক কোথাও যেন এই নরক কুণ্ডের বাসিন্দাদের মমতা ও ভালোবাসারূপ শুভ চেতনার সঞ্চারে নতুন করে জীবনকে দেখার সুযোগ করে দেন। পটলডাঙার এই বিষাক্তকর আবহওয়ায় লালিত হয়ে মানুষের মনে সুস্থ ও সুন্দরের স্বপ্ন কখন মৃত হয় না; হঠাত্ মমতা ও ভালোবাসারূপী সোনার কাঠির ছোঁয়ায় মনুষ্যরূপী শুভবোধের সঞ্চার হতেই পারে।

মণীশ ঘটক পরের 'রাত-বিরেতে' গল্পে আবার বস্তি জীবনের অন্ধকারময় দিকে পাঠকদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এই গল্পে মধ্যরাতে দেখা যায় আয়া ও নার্সের ষড়যন্ত্রে হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত শিশুরা পটলডাঙার বস্তিতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বড় রাস্তার উপর মস্ত তেতলা হাসপাতাল থেকে শীতের সময় নির্জন ও নিশ্চুপ মাঝরাতে সুখিয়া আয়া দুটো সদ্যোজাত মেয়েকে পটলডাঙার ঝুমনের হাতে তুলে দিতে দেখা যায়। এই ঝুমন সদ্যোজাত শিশু কেনাবেচা করে পটলডাঙার বস্তিতে বিক্রি করে। তার কাছে ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর কদর বেশি কেননা, এই মেয়েগুলিকে বড় করে সে বেশ্যালয়ে চালান দেয়। আর ছেলেগুলোর বেলাতে অন্য ব্যবস্থা- বাচ্চা অবস্থাতেই তাদের নুলো বা পঙ্গু করে হয় ভিক্ষুক হিসেবে গড়ে তোলে, নইলে ছোট থেকেই পকেটকাটা ও চুরিবিদ্যা শেখায়। কিন্তু বাচ্চা বিক্রির দর নিয়ে ঝুমনের সঙ্গে সুখিয়ার কথা কাটাকাটিতে মণীশ ঘটক এই সদ্যোজাত পচারকারীদের বাস্তব জীবন চিত্রিত করেছেন। ঝুমন টাকা পয়সার লেনদেন নিয়ে সুখিয়ার সাথে সমস্যা তৈরি হলে বলেছে- "তোদের বেশি দাম দেব কোন সাহসে? যদি মরে যায়? আর আমার তো নে গিয়ে পুষবার খরচ আছে। পাঁচ ছ দিনের ছা নিয়ে গে ন-দশ বছরেরটি করতে হলে খাওয়াতে পরাতে কী কম খরচ হয়? তার উপর সব কটা দেখতে ভালো হয় না। খারাপ হলে দামও কমে যায়। কতকগুলোকে আবার ঘরে বসিয়েই হিল্লে করতে হয়। এসব খরচ পুইয়ে শেষ-মেষ আমার তো থাকে কচু। আর ছোঁড়াগুলো তো বাজে খরচ! খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করি- চোক ফুটলেই নিজের পত দ্যাকে"[৩৬]। ঝুমনের শুধু এই ঝুঁকি নেই; ঝুঁকি রয়েছে পাচার করা সদ্যোজাতকে নিরাপদে পুলিশের চোখ এড়িয়ে খেঁদি মোড়লের কাছে নিয়ে যাওয়াতেও। তবে এ কাজে সে বিশেষ দক্ষ, তাই নিরাপদেই সে খেদি মোড়লের কাছে পৌঁছে যায়; কিন্তু খেঁদির ঘরে লোক আছে শুনে সে থমকে যায়। খেদি নিজের আস্তানাতেই এত বাবু আমদানি হচ্ছে দেখে, ঝুমনকে এখানেই বেশ্যাপট্টি খোলার প্রস্তাব দিয়ে বসে। "আমি বলি কী সর্দার, বাড়িউলি

মাসিদের কাচে ছুঁড়িগুলো না বেচে, এখানেই কেন ব্যবসা নাগিয়ে দাও না। আমি বলচি তোমায়, বাবুর অভাব হবে না"[৩৭]। খেঁদির এই প্রস্তাব পটলডাঙার বস্তিতে ভবিষ্যৎে বেশ্যাপল্লী গড়ে ওঠার ও এই ব্যবসাতে শ্রীবৃদ্ধির প্রস্তাব। তা বোধ হয় স্বভাবধূর্ত ঝুমন সর্দারের বুঝতে অসুবিধে হয় না; তবুও এত নতুন লোকের আগমনে শিশু পাচারের কথা ফাঁস হওয়ার ভয়ে সে খেঁদিকে সাবধানে কাজ করার পরামর্শ দেয়।

এই 'পটলডাঙার পাঁচালী' গ্রন্থে ভিন্ন স্বাদের গল্পও রয়েছে। তাঁর 'ভুখা ভগবান' গল্পটিতে প্রজার উপর জমিদারের শোষণ ও পীড়নের চিত্র রয়েছে। দেশে যখন খরা- আকাল ও আজন্ম দেখা দেয় তখন প্রজারা অর্থাভাবে খাজনা দেওয়া তো দূরে থাক; দু মুঠো অন্ন জোগাড় করতেও হিমসিম খায়। ঠিক এই অবস্থার শিকার কালু সেখ। জমিদার কিন্তু খরা-বন্যা-আকাল দেখে না তারা চায় যে কোন মূল্যে খাজনা তাই খাজনা-অনাদায়ে জমিদারের পেয়াদারা কালু সেখকে ধরে নিয়ে যায়। কালুর স্ত্রী ফতেমা জানে- "...খাজনা দেবার মতো অবস্থা যে তাদের নয়, ... আজ বছর খানেক প্রায় না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে চলছে"[৩৮]। তাই স্বামীর ছাড়া পাওয়ার আকাঙ্খায় সে অভুক্ত অবস্থায় দিন গুনতে থাকে। ঠিক এই সুযোগে লম্পট জমিদারের পুত্র তাকে ধর্ষণ করে মুখবন্ধের জন্য পাঁচ টাকা ফেলে রেখে চলে যায়। কালু ফিরে এলে ফতেমা তাকে দৈহিক অত্যাচারের কথা জানায়। সে রাতে রাগের মাথায় কালু সবল জমিদারের উপর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে যেতে চাইলে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে দুর্বলের লড়াইয়ে স্ত্রী ফতেমা বাধা দেয়। সে রাত- টুকু কাটার অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু ওই রাতেই ফতেমা "এরপর সহজভাবে স্বামীর সাথে বাস করা চ'লবে কিনা"[৩৯]। এই ভেবে ভেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সকালে পুকুর থেকে ফতেমার মৃতদেহ উদ্ধার করে কালু দুপুর পর্যন্ত মৃতদেহের দিকে কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থায় তাকিয়ে থাকে তারপর- "সে হঠাত্ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কম্পিত পদে দাওয়ায় পড়া নোটখানা তুলে নিয়ে খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটল"[৪০]।

"সমস্ত গল্পটি শেষ কয়টি পঙক্তি মানুষের হৃদয়বৃত্তির গভীরতর প্রদেশে বিদ্যুৎলাঞ্ছনার মত চমকে ও শিউরে ওঠে। গভীরতম শোকের সাথে ভীষণ ক্ষুধার জ্বালাকে পাশাপাশি রাখায় দুঃসহ ব্যঞ্জনা বিচ্ছুরিত। সবার শেষে শোক ভুলে যখন পাঁচ টাকার নোট দিয়ে খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটে যাবার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই এতদিনকার সর্বোত্তম মানবিক মূল্যবোধও ধ্বংস হয়ে যায়। একই সঙ্গে যুবনাশ্ব একটি মারাত্মক প্রশ্ন তুলে তার সমাধানও করে দেন এই বলে যে- যৌন ক্ষুধার চেয়েও পেটের ক্ষুধাই মানুষের বড় সমস্যা, জীবনের মূল সমস্যা অর্থাৎ ভুখা-ই ঈশ্বর"[৪১]। এখানে ক্ষুধার জ্বালা জীবনের অন্যান্য জ্বালা-যন্ত্রনার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের ক্রোধ, বিবেকবোধ, ঘৃণা তথা মনুষ্যত্বের মরণ

ঘটেছে। মণীশ ঘটকের জীবন ও সাহিত্য গবেষক জয়দেব বিশ্বাস পটলডাঙার পাঁচালীর এই গল্পগুলিতে একটা সম্পর্ক সূত্র আবিষ্কার করেছেন- "যুবনাশ্ব 'গোষ্পদ' গল্পে পটলডাঙা কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং দল বেড়ে ওঠে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই পটলডাঙা থেকে ভুখা ভগবানে তার উৎসস্থলে হাজির হয়েছেন। ফতিমা আত্মহত্যা না করলে পটলডাঙায় আসতে হতো। কালু সেখও পটলডাঙায় আসবে, না এসে তার উপায় নেই"[৪২]।
মণীশ ঘটকের পরের গল্প 'দুর্যোগ'-এ বার্জার্ড স্টিমারে করে পদ্মা নদীতে গিয়েছেন। সেখানে স্টিমারের যাত্রীরা পদ্মায় ওঠা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দূর্যোগে জলের স্রোতের তোড়ে জাহাজ কাত হয়ে গেলে যে যেদিকে পারে আত্মরক্ষার জন্য ছুটোছুটি করতে থাকে। এই অবস্থায় এক সুন্দরী যুবতী হিন্দু বধূ তার স্বামী অবিনাশ বোসকে না পেয়ে লেখককে খুঁজে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। অসহায় মহিলার সংকট ও দুশ্চিন্তার কথা মাথায় রেখে লেখক অবিনাশবাবুকে সারা জাহাজে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে স্টিমারের নীচে; এক অর্ধনগ্ন কুলিমেয়ের দিকে তাকিয়ে রসচর্চায় ব্যস্ত অবিনাশকে খুঁজে পান। বিপন্ন স্ত্রী পরপুরুষকে স্বামী খোঁজার জন্য পাঠিয়েছে শুনে অবিনাশ বোস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে স্ত্রীর নামে কুৎসিত ইঙ্গিত করেন। দুর্যোগ কেটে গেলেও স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে তাঁর ইতরতা ও অভদ্রতা তথা ডানপিটেমি কমে না। অবিনাশ বোসের এই ব্যবহারে ক্ষিপ্ত লেখক ঘুঁষি চালানোর উদ্যোগ নিলে তাঁর স্ত্রীর সেখানে আগমনে তা বাধা পায়; লেখক সেখান থেকে সরে আসেন। প্রচণ্ড দুর্যোগের দিনে যাত্রীদের যেখানে প্রাণসংশয়ের ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেখানে অবিনাশবাবুর মতো এক সদ্য বিবাহিত ব্যক্তির স্ত্রীকে কেবিনে ছেড়ে রেখে এসে নিম্নবর্ণীয় মহিলার প্রতি কুরুচিকর যৌন আসক্তি সমাজে বিকৃতরুচি ও রূপকে সামনে নিয়ে আসে। আলোচ্য গল্পে লেখক প্রদত্ত অবিনাশ চরিত্রের নামকরণটি বোধ হয় 'প্রবৃত্তির বিনাশ হয় না' বলেই রাখা হয়েছে। এই গল্পের বীভৎসতা পটলডাঙার বাসিন্দাদের বীভৎসতার চেয়ে ন্যূন নয়। এই শ্রেণীর মানুষেরা নিজেরা পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায়; কিন্তু নিজের স্ত্রীকে সর্বদা শৃঙ্খলে বাঁধতে চায়- দাবী করে সতীত্বের। এই ঘৃণ্য শ্রেণীর জীবরা পরপুরুষের সাথে কথা বলাতেও স্ত্রীর সতীত্বহানীর আশঙ্কা করেন। গবেষক জয়দেব বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে বলেছেন- "এই পাঠে মনে হয় পটলডাঙার সেই বীভৎস প্রবৃত্তিগুলির বিনাশ নেই, অ-বিনাশ বোধ হয়। উদার-মুক্ত প্রান্তরও বুঝি তাদের দাপটে একশো ভাগ উদার হতে পারে না। অন্যপোষাকে, অন্য আদলে বিস্তীর্ণ পদ্মার কোলেও সেই পটলডাঙা"[৪৩]।

'পটলডাঙার পাঁচালী' গল্পগুলির মধ্যে 'স্বাহা' গল্পটি সমাজের উঁচু সোসাইটির গল্প। লেখকের 'মান্ধাতার বাবার আমল' গ্রন্থে জানা যায় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের একমাত্র মেয়ে বিভা ছিলেন সম্পর্কে লেখকের মামীমা। তিনি

হরিশ মুখার্জি রোডে এক বৃহত্ অট্টালিকায় বসবাস করতেন। তাঁর স্বামী হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। লেখক ঐ বাড়ীতে বাবার নির্দেশ মতো কলেজ থেকে ফিরে যাতায়াত করতেন। এখানে কলকাতার বহু অভিজাত পরিবারের সমাগম হতো। তাঁর 'স্বাহা' গল্পটি এই অভিজাত পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করার অভিজ্ঞতার ফসল। এই সমাজের কৃত্রিম বিলিতিয়ানার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ- "আমলটাই এমন ছিল যে, যে কটি রত্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুত তারা সবাই ইংরেজের তাঁবেদারিতে ঢুকে পড়ত, আর হাস্যকর ইংরেজিপনার ঘর গেরস্থালি ছেলেমেয়ে নিয়ে 'নকল বুঁদির কেল্লা' বা ফিরিঙ্গি আঁস্তাকুড় বানাত। এই সব নকল ফিরিঙ্গিবাড়ির গিন্নিরা কিন্তু বেশিরভাগই মনে মনে সাবেকি চালচলন পছন্দ করতেন, সাহেবরাও জাত ইংরেজের ঠোক্কর খেতে খেতে শেষ বয়সে দেশপ্রেমিক হতেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা টেক্কা দিয়ে সাহেবিয়ানার চূড়ান্ত করতে ছাড়ত না। বাংলা ভুলত, বেয়ারা বাবুর্চির হিন্দি আর চুনোগলির ইংরেজিতে পোক্ত হয়ে উঠত"[৪৪]। এই গল্পে উঁচু সোসাইটির বিকৃত কামনা-বাসনার চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। গল্পতি শুরু হয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক অতিরিক্ত জেলা কালেক্টর দাস সাহেবের মেয়ে লটি দাসের আত্মহত্যা কেন্দ্র করে। দাস সাহেব এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভেঙে পড়লেও ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের অভ্যস্ত তাঁর স্ত্রী মিসেস দাস শোকসভায় আসা অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। লটি দাস এই অভিজাত সোসাইটির ডাকসাইটে সুন্দরী। শুধু রূপ নয় গুণও তার মুগ্ধ করার মতো। এই সোসাইটির যেকোন পার্টিতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি 'চার চাঁদ' লাগিয়ে দেয়; আবার তার অনুপস্থিতিতে পার্টি বিস্বাদ হয়ে ওঠে। এই লটির যৌবনোদভিন্ন মোহিনী রূপই তার সর্বনাশ ডেকে আনে। কামাতুর লম্পট ব্যক্তিরা ভদ্রতার মুখোশ সেঁটে এই সোসাইটিতে ঘুরে বেড়ায় এদের সর্বনাশ করার জন্য; গল্পে টুটু মল্লিক এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। তার বিকৃত কামনায় বলি হয় লটি দাস। অনুষ্ঠানে ঘুরতে গিয়ে পানিয়ে নেশাদ্রব্য মিশিয়ে অসহায় মহিলার ধর্ষণ এসমাজে আকছার ঘটে থাকে। লটি দাস এই অবস্থার শিকার। অতঃপর সমাজ কলঙ্কের ভয়ে তার আত্মহত্যা গল্পের চরম পরিণতি। গল্পের সূচনা এই পরিণতি দিয়েই। গবেষক জয়দেব বিশ্বাস তাই বলেছেন- "...আলাদা করা যায় না ফুটপাত আর স্বর্ণময় জগতের বাসিন্দাদের আচার আচরণকে। দুষ্কার্যের জাত সর্বত্র- সর্বাবস্থায় একই হয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না"[৪৫]। তবে গল্পটিতে মধুর রসের সঞ্চার করেছে ডাকাবুকো সাহসী ডাকুর সাথে লটির মধুর ভালোবাসা; যা টুটুর চক্রান্তে মধুর পরিণতির ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আলোচ্য গল্পে স্ত্রীর কৃত্রিম ড্রইংরুম কালচারকে ব্যঙ্গ করেছেন দাস সাহেব- "কাদের নিয়ে তোমার সেট লীলা? নিজের দেশে পরদেশী, একটিং এবং কৃত্রিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত জনকয়েক তাসের সায়েব বিবি। রাস্তার ভিখিরীর যা কালচার, যা Tradition, তাদেরও তাই, তফাত্ শুধু সিল্ক স্যুট ও ছেঁড়া কাঁথার"[৪৬]।

'পটলডাঙার পাঁচালী'র গল্পগুলি 'বিকৃত, অপধ্বস্ত জীবনের কারখানার' গল্প হলেও- এই অন্ধকার কালো মেঘের পশ্চাতে সূর্যোদয়েরও বিলক্ষণ প্রকাশ দেখিয়েছেন লেখক। তাই 'মান্ধাতার বাপের আমল' গ্রন্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পের সাথে আশ্চর্য রকমের মিল খুঁজে পান তিনি। তাঁর জীবনদর্শনের সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনদর্শন কোথাও যেন মিলে যায়। মণীশ বলেছেন- "মানুষ কত রকম ফাঁদে জড়িয়ে চিরসুন্দর জীবনকে বাঁধে- বিকৃত বিকলাঙ্গ করা সত্ত্বেও নির্মূল করতে পারে না। নিজের অতিসীমিত ক্ষমতায় আমিও তাই করেছি বস্তির জীবনালেখ্য, কানা খোঁড়া খাঁদা লম্পট চোর জোচ্চোর পকেটমারের ছবি এঁকে। জীবনবোধের পথে প্রেমেন ও আমি বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় দূর-দূরান্তরে চলে। গিয়েছি, কিন্তু জীবনপথে ভালোবাসতে পারা, আর না থামতে পারাই যে সবচেয়ে বড়ো পারা, এই সত্য সেদিনও পথ দেখিয়েছে আজও দেখায়। জীবন সাহিত্যের মৌল উপাদান"[৪৭]।

তথ্যসূত্রঃ

১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কল্লোল যুগ। এম সি সরকার। কলকাতা। ১৩৮৭। পৃষ্ঠা-৫৫।
২) কালনেমি। পৃষ্ঠা-৭১।
৩) রাত-বিরেতে। পৃষ্ঠা-৯১।
৪) সুবোধ দেব সেন। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পুস্তক মেলা। জানুয়ারি। ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-২১৫।
৫) শ্রী ভূদেব চৌধুরী। বাংলা কথাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৯৬২। পুনর্মুদ্রণ ২০১০-২০১১। পৃ-৩৬৫।
৬) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ১ম খণ্ড। পটলডাঙার পাঁচালী। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নভেম্বর। পৃ-৫৫।
৭) তদেব। গোষ্পদ। পৃ-৫২।
৮) রাত-বিরেতে। পৃষ্ঠা-৯৩।
৯) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ১ম খণ্ড। মৃত্যুঞ্জয়। পৃ-৮৫।
১০) তদেব। পৃ-৮৫।
১১) কালনেমি। পৃ-৭১।
১২) ভূদেব চৌধুরী। বাংলা কথাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ-৩৬৫-৩৬৬।
১৩) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ২য় খণ্ড। মান্ধাতার বাপের আমল। পৃ-১৪০।
১৪) তদেব। পৃ-১৪০।

১৫) তদেব। পৃ-১৪০।
১৬) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ১ম খণ্ড। পটলডাঙার পাঁচালী- গোষ্পদ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নভেম্বর। পৃ-৫৪।
১৭) জয়দেব বিশ্বাস। মণীশ ঘটক ঃ জীবন ও সাহিত্য। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ফেব্রুয়ারি ২০০২। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষককে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ২৫/০২/১৯৯৯ সালে। পৃ-৫৬।
১৮) তদেব। পৃ-৫৫।
১৯) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ১ম খণ্ড। পটলডাঙার পাঁচালী। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নভেম্বর। পৃ-৫৬।
২০) তদেব। পৃ-৫৮।
২১) তদেব। পৃ-৫৮।
২২) ভূদেব চৌধুরী। বাংলা কথাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ-৩৬৬।
২৩) আজহার ইসলাম। সাহিত্যে বাস্তবতা। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। ১৯৯৫। পৃ-১০৪-১০৫।
২৪) পটলডাঙার পাঁচালী। কালনেমি। পৃ-৬৯।
২৫) তদেব। পৃ-৭০।
২৬) তদেব। পৃ-৭১।
২৭) তদেব। পৃ-৭৩।
২৮) তদেব। পৃ-৭৩।
২৯) তদেব। পৃ-৭৩।
৩০) সুবোধ দেব সেন। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পুস্তক মেলা। জানুয়ারি। ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-২১৭।
৩১) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ১ম খণ্ড। পটলডাঙার পাঁচালী। মন্তশেষ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নভেম্বর। পৃ-৭৮।
৩২) তদেব। পৃ-৮০।
৩৩) তদেব। পৃ-৮০।
৩৪) মৃত্যুঞ্জয়। পৃ-৮৫।
৩৫) তদেব। পৃ-৮৮।
৩৬) তদেব। পৃ-৯১।
৩৭) তদেব। পৃ-৯৩।
৩৮) তদেব। পৃ-৯৫।
৩৯) তদেব। পৃ-৯৮।
৪০) তদেব। পৃ-৯৯।
৪১) জয়দেব বিশ্বাস। মণীশ ঘটক ঃ জীবন ও সাহিত্য। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ফেব্রুয়ারি ২০০২। পৃ-৬৬।

৪২) তদেব। পৃ-৬৬।
৪৩) তদেব। পৃ-৬৮।
৪৪) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ২য় খণ্ড। মান্ধাতার বাপের আমল। পৃ-১৬৭।
৪৫) জয়দেব বিশ্বাস। মণীশ ঘটক ঃ জীবন ও সাহিত্য। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ফেব্রুয়ারি ২০০২। পৃ-৬৯।
৪৬) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ১ম খণ্ড। পটলডাঙার পাঁচালী। স্বাহা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নভেম্বর। পৃ-১২৪।
৪৭) মণীশ ঘটক রচনা সংকলন। ২য় খণ্ড। মান্ধাতার বাপের আমল। পৃ-১৪৬।